উপনিষদ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও স্বামীজী

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

উপনিষদ ও শ্রীগীতা—যথাক্রমে শ্রুতিপ্রস্থান ও ও স্মৃতিপ্রস্থান—অধ্যাত্মপথের পথিকদের নিত্যপাঠ্য ও শ্রবণীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন এ-দুটি মহাগ্রন্থের মূলভাবের সম্মেলনেই যেন গড়ে উঠেছে। সফল মানবজীবনে তত্ত্বজ্ঞান ও তার ব্যবহার বা প্রয়োগ—উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন স্বীকৃত। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে উপনিষদ তত্ত্ব, গীতা তার ব্যাবহারিক আদর্শ। কোনও আচার্যের টীকা-ভাষ্য ব্যতিরেকেই যদি উপনিষদ বুঝতে চাই, তবে এটুকু ধারণা করতে পারি যে মানবজীবনের চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ও প্রাপ্তি—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ ও আত্যন্তিক মুক্তি এর প্রতিপাদ্য। তপস্যাপূত, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানলোকে উদ্ভাসিত চিরন্তন সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এ-গ্রন্থের মাধ্যমেই হয়েছে। এই সত্য আমাদের প্রবাহিত জীবন ও জীবনচর্যার কেন্দ্রীয় শক্তি যাকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে Nucleus, তাকে ঘিরেই মানবকুলের বিচিত্র পথপরিক্রমা। কিন্তু সেই অমৃত চিৎসম্পদ আছে সংগোপনে, হৃদয়গুহায়, 'অগম্যধামধামস্থে', অধরা, অজানা, untreaded, unattended, 'দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' (কঠোপনিষদ ১।২।১২)। মানবমনের অন্তরালে এই দুর্লভ সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন মুষ্টিমেয় তপস্যাপরায়ণ, স্থূলভোগ-বিমুখ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সত্যান্বেষী মুনিগণ এবং এঁরাই সেই দুরাগত আনন্দময় আলোকবার্তাটি শ্রবণ করিয়ে সীমিত শক্তিবিশিষ্ট, রোগ-শোক-হতাশাগ্রস্ত, মৃত্যুভীত মানবসন্তানদের অমরতার পথে যাত্রা করতে আহ্বান করেছেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', জানিয়েছেন আমাদের এই বিনাশশীল মানবজীবনের আধারেই রয়েছে অবিনাশী অমৃতরস, তা পান করো আর এই সত্যজ্ঞান লাভ করে ধন্য হও যে তুমি অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত শান্তির অধিকারী। আশ্চর্যভাবে সবকটি উপনিষদেই এই সুমহান বার্তাটি প্রচারিত হয়েছে এবং সগৌরবে ঘোষিত হয়েছে, 'একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

প্রধানত দুটি সাধনপদ্ধতি অবলম্বনে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করার কথা জানিয়েছেন উপনিষদ। একটি নঞর্থক—'নেতি নেতি'—'এ ব্রহ্ম নয়', 'এ ব্রহ্ম নয়'—প্রত্যক্ষবস্তু, দেবতা বা প্রতিমা উপাসিত হলেও ব্রহ্ম নয়—'নেদং যদিদমুপাসতে' (কেনোপনিষদ)। অন্যটি সদর্থক—'ইতি ইতি'—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। স্বামীজী 'নেতি নেতি' এই প্রাতিস্বিক ভাব বা individual বস্তুকে এক-এক করে ত্যাগ করে যে-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, তাকে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেও পরবর্তীতে জগতের ব্রহ্মভাব—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—এই সামূহিকভাবকে গ্রহণ করেছেন জীবজগতের কল্যাণসাধনে, এটিই তাঁর ব্যাবহারিক বেদান্তরূপে পরিচিত। দুটি পদ্ধতির সমন্বয়েই রচিত স্বামীজীর জীবনবেদ। গীতাতে এই সমন্বয়ের বাণী তিনি শুনেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই তাঁর জগদ্ব্যাপ্তিত্বের কথা অর্জুনকে শুনিয়েছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব', 'ময়া ততমিদং সর্বং জগৎ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখেও জীবজগদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্মের কথা তিনি বারংবার শুনেছেন। শ্রীগুরুর তপশ্চর্যাপূত পবিত্রতম জীবনলীলাই ছিল স্বামীজীর অধ্যাত্মপথের আলোকবর্তিকা, যেখানে তিনি বিচিত্র ও বিভিন্ন মহান ভাবের সমন্বয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এ-সত্যও তাঁর যুক্তিপ্রবণ মনের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল যে এই সমন্বয়ের পথেই মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় সম্ভব—কী ধর্মজীবনে, কী কর্মসাধনে—আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায়।

স্বামীজীর জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিচার করলে দেখা যায়, প্রাথমিক জীবনে অর্থাৎ শৈশব ও কৈশোরে তিনি তাঁর পরিবারে হিন্দু ঐতিহ্যগত দেবতাদের পূজা-অর্চনাদি দেখেছেন। বেদ-বেদান্ত বা গীতার আলোচনা শ্রবণের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রায় কোনও হিন্দু পরিবারেই এসবের প্রচলন ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণভিত্তিক সগুণ সাকার দেবতাদের লীলাকাহিনি বর্ণনা বা 'কথকতা' জাতীয় পাঠ, আলোচনা, শ্রীভগবানের মহিমাজ্ঞাপক কীর্তনাদি শ্রবণই ছিল সংসারে ভগবদ্ভক্তি প্রচার ও প্রসারের প্রধান মাধ্যম। স্বামীজীও তাঁর পরিবারে এই চিত্র দেখেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সহজাত ঈশ্বরপ্রীতিও এতেই কিছুটা তৃপ্ত ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে বেদান্তের উচ্চ আত্মতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হন ও তাতে প্রবলভাবে আকৃষ্টও হন। ব্রাহ্মগণ নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করলে দুটি ভাবের বিকাশ হল। এক, সর্বব্যাপী নিরাকার এক চৈতন্যসত্তায় বিশ্বাস ও তার ধ্যান, উপাসনা, উপনিষদের মন্ত্রের সমবেত উচ্চারণ, যেমন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি, যার ফলে হিন্দুধর্মের সাকার প্রতিমাপূজা (ওঁদের কাছে পুতুলপূজা), তার জটিল ক্রিয়া-কর্ম, বর্ণভিত্তিক জাতিভেদগত সংকীর্ণতা, পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য—এসব কিছুটা খর্ব হল। দুই, ব্রহ্মের 'নির্গুণ' রূপটির বদলে 'সগুণ' রূপটিকে গ্রহণ করায় ঈশ্বরকেও মানা হল তাঁর প্রার্থনা ভজন সহ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য ব্রাহ্মদের নিরাকারের সঙ্গে 'নির্গুণ'কে না নিয়ে সগুণ ধারণার মিশ্রণের অসারতা বা অর্থহীনতার দিকটি পরিহাসছলে তুলে ধরেছিলেন, 'এক গোয়াল ঘোড়া' বললে যেমনটি বোঝায়।

স্বভাবে প্রবলভাবে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ তৎকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ছুঁৎমার্গীয় লোকাচার, অসীম অনন্ত ঈশ্বরের প্রতিমা গড়ে পূজা ইত্যাদি পরিহার করে ব্রাহ্মদের খ্রিস্টীয় প্রথায় ছিমছাম নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাকে মনে মনে বরণ করে নিলেন। কিন্তু তাঁর জন্মাবধি ঈশ্বরপ্রীতি এইকালে প্রবলভাবে তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল ও তিনি তার তৃপ্তিসাধনে তৎপর হয়ে অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালীপ্রতিমা' পূজা ও তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শরণাগতি, জগন্মাতাজ্ঞানে তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবিশ্বাস, ভক্তদের শ্রীশ্রীঠাকুরের 'অবতারত্ব' স্বীকার—এইসবের প্রতি নরেন্দ্রনাথের তৎকালে বিরূপভাব

তাঁকে পরিপূর্ণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণে সমর্থ করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে যাওয়া-আসা করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মমত, ঈশ্বরতন্ময়তা, সমাধিলীনতা, কৃপাপরবশ হয়ে নরেন্দ্রনাথকে অনন্ত ব্রহ্মসত্তার আভাস দান—এসব অভিজ্ঞতা তাঁকে ওই নিরক্ষর কালীসাধকের অনুগত হতে বাধ্য করেছিল। এইখানেই তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ের শুরু ও এই স্তরেই তাঁর জীবনের পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ প্রাপ্তি বলেই তিনি মনে করেছেন। ১৮৯৫ সালে স্বামীজী গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখেছেন, ''তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) জীবনকে না বুঝলে বেদ বেদান্ত অবতার প্রভৃতি (এসব তত্ত্ব), বোঝা যায় না, কেননা He was the explanation।'' শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁকে জগন্মাতার সৃষ্ট জীবজগতের কল্যাণকর্ম করতে আদেশ করেন, প্রথমে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন, ঠিক যেমন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-কর্ম করার উপদেশ শুনতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন। পরে ভগবান রামকৃষ্ণদেব প্রেমময় দিব্য সংস্পর্শ ও তাঁর বাণীর দ্বারা স্বামীজীর হৃদয়ে সংসারতাপদগ্ধ অজ্ঞানী মানবসন্তানদের জন্য প্রেম ও সহানুভূতির সঞ্চার করে দিয়েছিলেন—'শিবজ্ঞান করে জীবসেবা'র যুগান্তকারী বার্তাটি দিয়ে তাঁর জ্ঞানচক্ষুটি যেন খুলে দিয়েছিলেন, যেখানে নিষ্কাম কর্ম ও আত্মজ্ঞানের এক অভিনব মিশ্রণ সাধিত হয়ে গেল, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মজ্ঞান অবলম্বনে নিষ্কামভাবে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব স্বীকার করে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত ও যুদ্ধে নিযুক্ত করেন।

যে-উপনিষদ তিনি এতদিন চর্চা করেছেন, তাতে নিষ্কামকর্ম সাধনার কথা নেই। নেই ভগবদ্‌ভক্তি বা শরণাগতি বা প্রপত্তির কথা, নেই ঈশ্বরের অবতার বা মনুষ্যদেহ অবলম্বনে তাঁর অবতরণের কথা জীবজগতের কল্যাণে। শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিগুলি—যেমন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, জীবজগৎ সহ ব্রহ্মের 'বিরাট' রূপের দর্শন এবং তাঁর স্বল্পায়তন জীবনে তার সার্থক প্রয়োগ ও তার দ্বারা অমৃত আনন্দলাভ—এসবই স্বামীজীকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। বলাবাহুল্য তিনি এসব আধ্যাত্মিক ভাবের সন্ধান উপনিষদে পাননি, পেয়েছিলেন গীতাতে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে তাঁর অবতারত্ব স্বীকার করেছেন এবং আত্মজ্ঞান ও জগতের কর্তব্যকর্মকে সমভাবে গ্রহণ করতে অর্জুনকে আদেশ করেছেন। তিনি নিজেও একইসঙ্গে 'জ্ঞানমুদ্রায়' ও 'তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে', একাধারে তিনি 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নম্' রূপে আবির্ভূত হয়েছেন যুগোপযোগী ভাগবতধর্ম প্রচার ও প্রসারে। স্বামীজী লিখেছেন, ''উপনিষদ থেকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করে গীতারূপ সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হয়েছে।'' স্বামীজী বলেছেন, ''উপনিষদে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলতে চলতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা যেমন জঙ্গলে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ, তার শেকড়, কাঁটা পাতা সব সমেত। গীতার মধ্যে ওই সত্যগুলিই অতিসুন্দর রূপে সাজানো, যেন একটি ফুলের মালা।'' বুঝিয়েছেন ছড়ানো কুসুমের থেকে গ্রথিত মালার সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। তাঁর মতে অদ্বৈতনিষ্ঠ প্রস্থানত্রয়ীর মধ্যে গীতা অন্যতম স্মৃতিপ্রস্থান যা কালোপযোগী বিধান দিয়ে জনসমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণসাধনে তৎপর, একইসঙ্গে গীতা ব্রহ্মযোগশাস্ত্রও। তিনি লিখেছেন, ''শ্রীবুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা, যীশুখ্রিস্ট প্রার্থনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও দিব্যভাব লাভ করেছিলেন, গীতায় বর্ণিত অনাসক্ত কর্মী নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সেই উচ্চাবস্থা লাভ করবেন।'' (গীতাভাষণ, সানফ্রান্সিসকো)। এখানেই তিনি জানিয়েছেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

গীতার এই একটি শ্লোক যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করলে সম্পূর্ণ গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়। আমাদের সকল দুঃখের কারণই মনের দুর্বলতা, মোহ বা অজ্ঞানতা। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মযুদ্ধে অনিচ্ছুক বিমর্ষ অর্জুনকে আত্মশক্তি সহায়ে সাময়িক মানসিক ভীতি-দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াতে প্রেরণা দিয়েছেন। কঠোপনিষদে যে-উদ্দীপক মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—গীতার ওই শ্লোকে তারই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই। সমগ্র উপনিষদে আত্মজ্ঞান সহায়ে যে-'অভী'ভাব ব্যক্ত হয়েছে, সেটি স্বামীজীকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক কথাগুলির মধ্যে ওই একই ভাব ব্যক্ত বলে মনে করেছেন তিনি। তাঁর গুরু স্বামীজীর মধ্যে এই বীরত্বের প্রতি সহজাত আকর্ষণ লক্ষ করেই একদিন বলেছিলেন, ''তুই যে বীর রে!''

উপনিষদ ও গীতায় 'ত্যাগ'ই প্রধান প্রতিপাদ্য কারণ বিষয়াসক্তি ত্যাগ বা বৈরাগ্যই একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভের সহায়ক : ''ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।'' গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও রাজযোগ—এই চতুর্বিধ যোগের সাধনেই 'অনাসক্তি' বা 'কর্মফলত্যাগ' প্রথম সোপান। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বাক্যেই গীতার প্রতিপাদ্য ব্যক্ত করেছেন—''গীতা উল্টে বললে যা হয়, তাই গীতার অর্থ।'' অর্থাৎ 'ত্যাগী'। 'ত্যাগী' আর 'তাগী' সমার্থক।

স্বামীজী বলেছেন উপনিষদে শ্রদ্ধার কথাই বেশি বলা হয়েছে, ভক্তি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ উল্লেখ নেই। নচিকেতার উপাখ্যানেও 'শ্রদ্ধা আবিবেশ'—এমনটিই বলা হয়েছে। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান ভক্তির মহিমা বারংবার উল্লেখ করেছেন। ভক্তিযোগে জ্ঞানযোগের সাধনপদ্ধতির দুরূহতা দেখিয়ে বলেছেন, অনন্যা ভক্তিতে যারা মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পণ করে, তারা আমাকেই লাভ করে। 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'। একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন,

''ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥''

—''হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতাররূপে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হন, অন্য উপায়ে নয়।'' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেও স্বামীজী বারংবার এই প্রেমাভক্তি, গোপীদের রাগানুগা ভক্তি—যা শুধু নিষ্ঠাভক্তি নয়—তার মহিমা শ্রবণ করেছেন এবং দেখেছেন শ্রীগুরুর মধ্যে সেই ভক্তির তীব্র প্রকাশ, যা তাঁকে পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে সমাধিতে ডুবিয়ে দিত।

উপনিষদে কর্মযোগের কথা নেই, গীতায় তারই বিশেষ প্রাধান্য। উপনিষদে 'কৃত দিয়ে অকৃতকে পাওয়া যায় না', অর্থাৎ কর্ম দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না, এমনটিই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গীতায় শ্রীভগবান এর বিপরীত কথা শুনিয়েছেন অর্জুনকে ''কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।'' শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও তিনি প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন বিভিন্ন যোগসাধনার সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অক্লান্ত কর্মী ছিলেন তবে তাঁর তপস্যা সহ সব কর্মই ছিল পরার্থে। স্বামীজী তাঁর স্তবে তাঁকে 'কর্মকঠোর' রূপেই বর্ণনা করেছেন। শুধু চারটি যোগেরই সমন্বয় নয়, ঠাকুরের জীবনে বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের সমন্বিত প্রকাশ দেখে এ-সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এই আদর্শেই ধর্মকে ভারতের জাতীয় জীবন গঠনকারীরূপে গ্রহণ করতে হবে।

উপনিষদের যে-অদ্বৈতভাব, গীতাতেও তারই গ্রহণ। কিন্তু প্রথমটিতে জ্ঞানের পথে বিশুদ্ধ অদ্বৈতের ওপরেই বিশেষ জোর দিয়ে শুধু মুষ্টিমেয়েরই সাধন করে তোলার দিকে প্রবণতা

দেখা যায়, সেক্ষেত্রে গীতা অনেক উদার। এখানে ভগবান 'স্ত্রী, বৈশ্য তথা শূদ্র' সকলকেই এই সাধনের অধিকার দান করে সমাজের সকলের প্রতি সুবিচার ও সমদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'' এই উদারতা স্বামীজীকে বিশেষ প্রভাবিত করে। স্বামীজী লিখেছেন, ''Highest advaitism cannot be brought down to practical life'', এবং তার জন্য তাকে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোও যাবে না। চলমানতাই যেখানে জীবনধর্ম, সেখানে ধর্মজীবনেও সমতা রক্ষা করতে হবে। স্বামীজীর এই মনোভাবটিই রোমাঁ রোঁলা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন : ''Religion is never an accomplished fact. It is ceaseless action and the will to strive, the outpouring of a spring; never a stagnant pond''।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান ধর্মজীবনের সংস্পর্শই স্বামীজীকে এই সর্বোচ্চ তত্ত্বে স্থিত করিয়েছিল যে, এক অখণ্ড চৈতন্যময় বা ভগবৎ-অস্তিত্ব—যার মধ্যে নিরাকার, সাকার, নির্গুণ, সগুণ সত্তা, জ্ঞান, ভক্তি, ঈশ্বর, জড়জগৎ, মানবসমাজ সবকিছুই সুসমন্বিত হয়ে আছে—এই সত্যকে শুধুমাত্র জ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। যা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তাকে জানতে হবে সমষ্টিগতভাবে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, যা আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ স্তর। স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্তরে তুলেই জীবজগতের হিতসাধনে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতি স্বামীজীর ব্যাবহারিক বেদান্ত, যাকে বলা যেতে পারে উপনিষদ ও গীতার বাণীর এক সফল ও সমন্বিত রূপ।

স্বামীজীর জীবনের যে-তিনটি পর্ব নিয়ে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে, তাতে দেখা গেল—প্রথম পর্বটিকে বলা যায় thesis—যেখানে দেবতা, মূর্তি, পূজাদি কর্ম, পুরাণাদিতে, হিন্দুধর্মের চিরাচরিত ঐতিহ্যে তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি। দ্বিতীয় পর্বে antithesis—যেখানে এ-পথ পরিত্যাগ করে বিপরীত পথে পরিভ্রমণ অর্থাৎ ঔপনিষদিক বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের অবলম্বন। তৃতীয় পর্বে synthesis—পূর্ব দুই মার্গের মিলন অর্থাৎ বিশ্বাস-ভক্তি সহ জ্ঞানপথ বা আত্মজ্ঞানের পথে কর্মোদ্যোগ। বলা যেতে পারে, উপনিষদ যদি হয় তাঁর আত্মা, তবে গীতা তাঁর প্রাণস্পন্দন। উপনিষদ যদি তাঁর প্রাণবায়ু, তবে গীতা তাঁর জীবনচর্যা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনজ্যোতিতে ভাস্বর স্বামীজীর এই ভারসাম্যময় জীবনখানি আমাদের জীবনপথের পাথেয় হোক, এই প্রার্থনা। ✠

ভ্রম সংশোধন

গত সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যায়
২৯৩ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দের স্থলে রথীন্দ্রনাথ হবে,
২৮৯ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের নিচের থেকে ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়' স্থলে চিন্ময় লাহিড়ী হবে।